দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় ও সোভিয়েত জনগণের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্বে, ১৯৪৫ সালের ৮ই মে ফ্যাসিস্ট জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটাকেই গোটা বিশ্বে ফ্যাসিস্টদের পরাজয়ের দিন বলে চিহ্নিত করা হয় এবং নানাভাবে পালিত হয়। এই দিনটি মনে করিয়ে দেয় মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত লাল ফৌজের সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করার মরণপণ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও লড়াইয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এই লড়াইয়ের ফলে হিটলারের জার্মানি, যে ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করার প্রধান শক্তি, শুধু যে সেই জার্মানি পরাজিত হয় তাই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও অবসান হয়। হিটলারের নেতৃত্বে অক্ষশক্তির অপর সঙ্গী মুসোলিনি ১৯৪৩ সালেই তার পদ থেকে অপসারিত হয়েছিল এবং রোম থেকে পালিয়ে গিয়ে জার্মান দখলিকৃত এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৪৫-এ জার্মানির পতনের ঠিক আগে মুসোলিনি ইটালির পার্টিজানদের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়। আর মূলশক্তি জার্মানির আত্মসমর্পণ এর পরেই কয়েক মাসের মধ্যে অক্ষশক্তির অপর সদস্য জাপান ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছিল ৬ বছর, যে যুদ্ধে ৬১টি দেশ জড়িয়ে পড়েছিল, মারা গিয়েছিল ৫ কোটিরও বেশি মানুষ, সেই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

ফ্যাসিস্টদের পরাজিত করার জন্য স্ট্যালিনকে অভিনন্দন জানান অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীরা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয়কে জনগণ যেমন গভীর আবেগের সাথে অভিনন্দন জানায়, তেমনই বিশ্বের সমস্ত অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের স্থপতি, এবং সোভিয়েত প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতা স্ট্যালিনকে এবং সোভিয়েত লালফৌজ ও সোভিয়েত জনগণকে ফ্যাসিবাদের বিপদ থেকে বিশ্বের উদ্ধারকর্তা এবং রক্ষাকর্তা হিসেবে অভিনন্দন জানান। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় গিয়ে সেখানে তখন যে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ চলছিল তা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন, ''আপাতত রাশিয়ায় এসেছি– এখানে না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত... এরা একটা নতুন জগত গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।'' সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর গভীর প্রত্যাশার জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ-জার্মান লড়াইয়ের সময় কবি রোগশয্যায় শুয়ে থেকেও প্রতিদিন যুদ্ধের খবর নিতেন। লালফৌজ পিছু হঠেছে শুনলে মুখ কালো হয়ে যেত। লালফৌজ এগিয়েছে শুনলে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বলতেন 'ওরাই পারবে'। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন, স্ট্যালিনের কাছে চিঠি লিখে তাঁর জার্মানিতে আটকে পড়া নিখোঁজ আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মীদের উদ্ধার অথবা খোঁজের জন্য এক মর্মস্পর্শী আবেদন করেন। নেতাজি সুভাষ বলেন, আগামী কয়েক দশকের বিশ্বের ভবিষ্যৎ থাকবে মার্শাল স্ট্যালিনের হাতে। হিটলারের আক্রমণে রাশিয়ায় দু-কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের প্রাণ যায়। প্রায় সমস্ত বড় শহর বোমা এবং কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়। এমন কোনও পরিবার ছিল না যার কেউ না কেউ এই যুদ্ধে প্রাণ দেয়নি। জার্মান অধিকৃত এলাকায় কোনোমতে বেঁচে থাকা রুশদের বর্বর অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েতের বিজয়ের পরেও স্ট্যালিন এর প্রতিশোধ নিতে চাননি। ৯ মে ১৯৪৫ তারিখে স্ট্যালিন তাঁর জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজয় উপলক্ষে বক্তৃতায় বলেন, তিন বছর আগে হিটলার বলেছিল তার লক্ষ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করা এবং তার সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তার থেকে কেড়ে নেওয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমনভাবে ধ্বংস করা যাতে আর সে কোনোদিনই উঠে দাঁড়াতে না পারে।... হিটলারের উন্মাদের মতো ভাবনা এবং লক্ষ্য পূরণ হয়নি। আজ আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজয় উৎসব পালন করছি, কিন্তু আমরা জার্মানিকে

টুকরো টুকরো করতে বা ধ্বংস করতে চাই না! "Three years ago Hitler declared for all to hear that his aims included the dismemberment of the Soviet Union... 'We will destroy Russia so that she will never be able to rise again', ... However, Hitler's crazy ideas were not fated to come true... The Soviet Union is celebrating victory– although it does not intend either to dismember or to destroy Germany." (Victory Speech, 9th May, 1945)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় জার্মানির বিদ্যুৎগতির যুদ্ধ

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর পোল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দিনটাকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনা করে থাকেন। এরপরে ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত হিটলার পরপর ইউরোপের নয়টি দেশ দখল করে। সেই দেশগুলি হল পোল্যান্ড (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯), ডেনমার্ক এবং নরওয়ে (এপ্রিল ১৯৪০), বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং লুক্সেমবুর্গ (মে ১৯৪০), ফ্রান্স (মে ১৯৪০), যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রিস (এপ্রিল ১৯৪১)। পোল্যান্ডের আগে তারা চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরি দখল করেছিল। এই পর্যায়ের যুদ্ধে জার্মান ঝটিকা বাহিনী এই সব দেশের সমস্ত প্রতিরোধকে কার্যত নস্যাৎ করে এগিয়ে যায়। এর মধ্যে ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ড ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ। ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইন এবং বেলজিয়ামের সিগফ্রিড লাইনকে ভাবা হত দুর্ভেদ্য প্রতিরোধশক্তি। কিন্তু জার্মান ঝটিকাবাহিনী নতুন কায়দায় যুদ্ধ করে এই সমস্ত প্রতিরোধকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। এই নতুন কায়দায় যুদ্ধের নাম ছিল বিদ্যুৎগতির যুদ্ধ (blitzkrieg)। এই পদ্ধতিতে একই সঙ্গে আকাশপথে বিমান আক্রমণ, স্থলপথে চলন্ত দূর্গ তখনকার অত্যাধুনিক জার্মান প্যানজার ট্যাংক বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণ এবং তার পিছনে পদাতিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রম, প্রতিপক্ষকে দিশাহারা করে দিত। এর ফলে এই পর্যায়ে যে যুদ্ধ হয় তাতে ইউরোপের একের পর এক দেশ কার্যত বিনা প্রতিরোধে অথবা অতি সামান্য প্রতিরোধে জার্মান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। একই সময়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের আফ্রিকা বা এশিয়ায় যে সব কলোনী ছিল, জার্মান, ইটালিয়ান ও জাপানী বাহিনী সেগুলিকেও দখল করার জন্য যুদ্ধে নামে। জার্মান সেনাপতি রোমেল যুদ্ধের এই পর্যায়ে আফ্রিকায় একের পর এক বৃটিশ কলোনি বিদ্যুৎগতির যুদ্ধে দখল করছিল। ইতিহাসবিদরা এই পর্যায়ে ইউরোপে হিটলারের বাহিনীর যুদ্ধকে ক্যালেন্ডার ওয়ার (calendar war) বলেছেন। কারণ হিটলার এবং তার বাহিনী এই সময় এতই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে হিটলার কোনো দেশ আক্রমণ শুরু করার এবং দখল করার আগে থেকেই কবে সেই দেশের রাজধানীতে বিজয় উৎসব করবে, তা ঘোষণা করে দিত, আর সেই ঘোষিত দিনের আগেই হিটলারের ঝটিকা বাহিনী সেই দেশের রাজধানীতে পৌঁছে যেত! কেউ কেউ আবার এই পর্যায়ের পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধকে নকল যুদ্ধ বা phoney war বলেছেন।

মাত্র ছয় সপ্তাহে ফ্রান্স দখল

ফ্রান্স ছিল সেই সময় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ। বিশ্বের নানা মহাদেশে তার উপনিবেশ ছড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের প্রতিরক্ষার জন্য সারিবদ্ধ দুর্গ নিয়ে গঠিত ম্যাজিনো লাইনকে গোটা বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা হত। সেই ফ্রান্স দখল করতে হিটলারের বাহিনী সময় নেয় মাত্র ছয় সপ্তাহ। যথেষ্ট শক্তিশালী বেলজিয়াম দখল করতে হিটলারের বাহিনী সময় নেয় মাত্র ১৮ দিন। এই পর্যায়ে কোথাও কোনও বড় শহরে যুদ্ধ হয়নি। জার্মান বাহিনী শহরের খুব কাছাকাছি চলে এলে শহরের নাগরিকরা শহর ছেড়ে চলে যেত বা শহরের কর্তৃপক্ষ জার্মান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করত, ধ্বংস এবং নাগরিকদের মৃত্যু এড়ানোর জন্য।

ডানকার্কে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর 'সফল' পশ্চাদপসারণ!

২২শে জুন ১৯৪০-এ ফ্রান্স জার্মানির কাছে আত্মসমর্পন করে। বাস্তবে জার্মানি যখন ফ্রান্স দখল করে সেই সময় বৃটিশ-ফরাসি মিত্রবাহিনীর প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য ফ্রান্সে ছিল। জার্মান বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে চতুর্দিক থেকে এই বাহিনী ঘেরাও হয়ে ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে জার্মান বাহিনী এই যৌথবাহিনীকে ডানকার্ক সমুদ্রবন্দর দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে! এই পশ্চাদপসারণের মাধ্যমে বৃটিশ বাহিনী ৩৩৮,০০০ সৈন্যকে উদ্ধার করে। এই উদ্ধার কাজ চলে ১৯৪০ সালের মে এবং জুন মাস জুড়ে এবং এই পর্যায়ের যুদ্ধে ডানকার্কের এই সফল পশ্চাদপসারণকেই (successful retreat) বৃটিশরা বিরাট সাফল্য বলে বর্ণনা করে গোটা বিশ্বে প্রচার করতে থাকে! যদিও বৃটিশ বাহিনী যে বিপুল পরিমানে অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ, বিরাট সংখ্যক ট্যাংক এসব ডানকার্কে ফেলে আসে এর সবটাই জার্মান বাহিনীর হাতে পড়ে এবং তারা রাশিয়ার যুদ্ধে তা ব্যবহার করে। এসব

কথা বৃটিশ প্রচার মাধ্যম তাদের এই 'বিরাট সাফল্যে'র খতিয়ানের মধ্যে সম্পূর্ণ চেপে যায়। কার্যত জার্মান বাহিনী বৃটিশ ফৌজকে ধ্বংস না করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। নাহলে তারা এই সময় বিরাট সংখ্যক সৈন্য, যারা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় ছোট ছোট যাত্রী নৌকা করে ইংলন্ডে পার হয়ে যাচ্ছিল, তাদের বোমাবর্ষণ করেই সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারত; কিন্তু নিষ্ঠুরতার জন্য বিখ্যাত জার্মান বাহিনী এক্ষেত্রে তা করেনি, কারণ উপর থেকে নির্দেশ ছিল না। যখন জার্মানির ট্যাংক বাহিনী মিত্রশক্তির ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্যদের তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, পেছনে সমুদ্র, এবং জার্মান বাহিনী চূড়ান্ত লড়াইয়ে তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত, সেই সময় আচমকা ২৪ মে ট্যাংক বাহিনীর কাছে হিটলারের নির্দেশ আসে থেমে যাওয়ার! হিটলারের বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল হালডার বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে তার ডায়েরিতে লিখেছেন, এই আক্রমণ হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বয়ং হিটলারের নির্দেশে। ''Our left wing, consisting of armour and motorised forces, will thus be stopped dead in its tracks on the direct orders of the Fuhrer. Finishing off the encircled enemy army is to be left to the Air Force.'' (Rise and Fall of Third Reich, William L Shirer)। বাস্তবে ডানকার্কের অতি অগভীর জলে এত বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বড় জাহাজ আসা সম্ভব ছিল না তাই ছোট ছোট নৌকায় এই বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে পার করে ইংলন্ডে নিয়ে যেতে অনেকদিন সময় লাগে। হিটলারের বিমানবাহিনী কিন্তু তাদের আক্রমণ করা বা ডুবিয়ে দেওয়ার প্রায় কোনো চেষ্টাই করেনি; যা করলে মিত্রবাহিনীর বিপর্যয় হয়ে যেত! যার ফলে মিত্রপক্ষ বিরাটসংখ্যক সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এটাকেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, এবং প্রচারযন্ত্র বিরাট সাফল্য বলে চিৎকার করতে থাকে!

হিটলার ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লড়ল না কেন

অনেকেই বলেন বহু জার্মান ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের ব্রিটেনের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা ছিল (যেমন বিরাট জার্মান ইস্পাত ব্যবসায়ী [Krupp] ক্রুপ)। এই রকম জার্মান পুঁজিপতিদের চাপেই হিটলার ডানকার্কে ব্রিটিশ বাহিনীকে বদান্যতা দেখায়! এর পরে যুদ্ধের তখনকার গতি অনুযায়ী হিটলারের স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়ার কথা ছিল ইংলন্ড দখল। সে চেষ্টা করলে তখন জার্মান বাহিনীর যা মনোবল তাতে অনায়াসেই ইংলন্ড দখল করতে পারত। কিন্তু হিটলার আর সেদিকে এগোয়নি। কাগজে কলমে হিটলারের সেনাপতিরা 'অপারেশন সী লায়ন' বলে ইংলন্ড দখল করার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে। কিন্তু হিটলার তাকে কার্যকরী করার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। যুদ্ধের পরে জার্মান সেনাপতি গুন্থার ব্লুমেন্ট্রিট বৃটিশ লেখক লিডেল হার্টকে ২৪শে মে'র হিটলারের অদ্ভুত নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন, হিটলার আমাদের মধ্যে প্রায়ই ইংলন্ড সম্বন্ধে প্রশংসা করে আমাদের আশ্চর্য করে দিতেন। বলতেন গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীতে যে সভ্যতা এনেছে, তার জন্য তার অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন, শুধু ইংলন্ডকে ইউরোপে জার্মানির অবস্থানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ''He (হিটলার) then astonished us by speaking with admiration of the British Empire, of the necessity for its existence– and of the civilisation that Britain had brought into the world ... He said that all he wanted from Britain was that she should acknowledge Germany's position on the continent.'' (ibid). এছাড়া 'অপারেশন সী লায়ন' প্রসঙ্গে বলে, আমাদের মধ্যে আলোচনা হত যে 'অপারেশন সী লায়ন' নিছক একটা ধোঁকা! ... among ourselves we talked of it (Sea Lion) as a bluff.'' হিটলারের একজন অতি গুরুত্বপুর্ণ সেনাপতি ফন রুন্ডস্টেড বলেন, আমার মনে হয় হিটলার কখনই ইংলন্ড আক্রমণ করতে চায়নি। ''I have a feeling that the Fuhrer (Hitler) never really wanted to invade England...'' (ibid). ডানকার্কের পরেই হিটলারের ঝটিকা বাহিনী রাশিয়ার দিকে নজর ঘোরায় এবং সোভিয়েতকে ধ্বংস করার প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করে। শোনা যায় এই সময় এক বিশিষ্ট বৃটিশ অতিবৃহৎ পুঁজিপতি, যিনি বিভিন্ন জার্মান শিল্পসংস্থায় বিনিয়োগ করেছিলেন, তিনি বিশেষ বিমানে গোপনে বার্লিনে উড়ে যান এবং হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপরেই হিটলারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে সোভিয়েত রাশিয়া দখল করা। এখান থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরতে শুরু করে।

অপারেশন বারবারোসা

২২ জুন ১৯৪১ তারিখে হিটলারের বিপুল বাহিনী রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আক্রমণের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন বারবারোসা'। এই অপারেশন সংক্রান্ত নির্দেশ হিটলার অনেক আগে, অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪০-এই জারি করেছিল। ১৯৪০-এর জুলাই মাসে হিটলার তার কিছু সেনাপতিদের সঙ্গে ইংলন্ড আক্রমণ না করে রাশিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনার কথা কথা বলে। সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার সময় হিটলার তার সর্বাধিক

সৈন্য, ট্যাংক, বিমানবহর, অস্ত্র-শস্ত্র এসব নিয়োগ করেছিল এই ফ্রন্টেই। সবথেকে যুদ্ধ কৌশলে দক্ষ এবং সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীগুলি এই ফ্রন্টে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত জার্মান ফ্রন্টে মোতায়েন হয়েছিল ২১৯ ডিভিশন নাজি সেনা, যখন আফ্রিকা বা অন্যান্য ফ্রন্টে নাজি সেনার সংখ্যা ছিল মাত্র ১১ ডিভিশন। এমনকি ১৯৪৪-এর জুনে যখন ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডির উপকুলে মিত্রশক্তির ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী অবতরণ করে পশ্চিম ইউরোপের দিকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলে, তখনও পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রশক্তিকে মোকাবিলার জন্য ছিল মাত্র ৮৫ ডিভিশন এবং পূর্ব রণাঙ্গন অর্থাৎ রাশিয়ান বাহিনীর প্রতি আক্রমণ আটকানোর জন্য ছিল ২৩৯ ডিভিশনেরও বেশি সৈন্য। বিমান, ট্যাংক বা অন্যান্য যন্ত্রপাতিও একই অনুপাতে মজুত ছিল। জাপানও এশিয়ার রাশিয়ান সীমান্তে তাদের সবথেকে শক্তিশালী এবং দক্ষ বাহিনী কোয়ান্টুং ডিভিশনকে পুরো সময় জুড়ে মজুত রেখেছিল। (তথ্যসূত্র- ২য় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কয়েকটি প্রধান লড়াই, প্রগতি প্রকাশন)

ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ

রাশিয়ার অভ্যন্তরে ফ্যাসিস্ত জার্মান বাহিনী তিনটি প্রধান বড় শহর দখল করবার জন্য আক্রমণ চালায়। সেগুলি হল উত্তরে লেনিনগ্রাড, মাঝে রাজধানী মস্কো, এবং দক্ষিণে স্ট্যালিনগ্রাড। এছাড়া, কিয়েভ, খারকভ, স্মলেনস্ক, কুর্স্ক প্রভৃতি শহরগুলিও জার্মান বাহিনী আক্রমণ করে। তিনটি প্রধান বড় শহরের মধ্যে মস্কো এবং লেনিনগ্রাড ঘিরে রাখলেও ভিতরে ঢুকে দখল করতে পারেনি। জার্মান বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করতে পারে একমাত্র স্ট্যালিনগ্রাড শহরে। তারা স্ট্যালিনগ্রাড আক্রমণ শুরু করে ১৭ জুলাই ১৯৪২। এই শহরের ভিতরে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, দখল, পুনর্দখল চলে সাড়ে ছয় মাস ধরে। স্ট্যালিনগ্রাড শহরের এক একটা এলাকায় জার্মান সৈন্য যখন ঢোকে তখন সেখানে তাদের সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধের সামনে পড়তে হয়। এখানে এক একটা বাড়ি দখলের জন্য দিনের পর দিন লড়াই (house to house battle) চলে। বহু ক্ষেত্রে এক একটা পাড়া, এক-একটা বাড়ি দখল, পুনর্দখল চলতে থাকে দিনের পর দিন। কামান, দূর পাল্লার অস্ত্র-শস্ত্র এখানে অচল হয়ে যায়। পিস্তল, রাইফেল, বেয়নেট, ছুরি, গ্রেনেড এসব নিয়ে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকে। গোটা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। বারুদের গন্ধ এবং মৃতদেহের স্তুপ পচে এমন দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় যে কুকুর বেড়ালও শহর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু রুশ-জার্মান মরণপণ যুদ্ধ এই শহরে সাড়ে ছ'মাসের বেশি সময় ধরে চলে। এই যুদ্ধে রুশ বাহিনীর প্রতিরোধ মানব সভ্যতার যুদ্ধের ইতিহাসের অতীতের সমস্ত নজিরকে ছাপিয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর পর জার্মান বাহিনী এই প্রথম সম্পূর্ণ পরাজিত হল। জার্মান ষষ্ঠ বাহিনীর সেনাপতি ভন পাউলাস, যে স্ট্যালিনগ্রাড দখলের দায়িত্বে ছিল, সে রুশ বাহিনীর দ্বারা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে, খাদ্য, ওষুধপত্র, অস্ত্র-শস্ত্রের সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, বার বার হিটলারের কাছে পিছু হঠা বা শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসার অনুমতি চায়। কিন্তু হিটলার কোনোমতেই রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত জার্মান ষষ্ঠ বাহিনী ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে সোভিয়েত লালফৌজের দ্বারা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে গিয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। বন্দী হয় এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনেরাল ভন পাউলাস।

স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের আগে মস্কো শহরের উপকণ্ঠে এবং লেনিনগ্রাড শহর দখলের লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও হয় লালফৌজের মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধ। কিন্তু তীব্রতা এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ বিশ্বের সমস্ত যুদ্ধকে ছাপিয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এখান থেকে জার্মান বাহিনীর পরাজয় এবং সোভিয়েত বাহিনীর ঘুরে দাঁড়ানো শুরু হল। স্ট্যালিনগ্রাডের ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়ের পর সোভিয়েত বাহিনীকে আর আটকে রাখা যায়নি। সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণ শেষ পর্যন্ত বার্লিন দখল পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই প্রতি আক্রমণের পর্যায়ে সোভিয়েত বাহিনী ডেনমার্ক, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশকেও নাজি দখলদারির হাত থেকে মুক্ত করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫-এর ৮ই মে সোভিয়েত লালফৌজ বার্লিন দখল করে এবং রাইখস্টাগের উপর কাস্তে হাতুড়ি তারা খচিত লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়!

কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল

অনেক দক্ষিণপন্থী ইতিহাসবিদের মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হিটলার, মুসোলিনির মতো কিছু যুদ্ধোন্মাদ নেতাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সার ফল। অতীত ইতিহাসে ব্যক্তি রাজার যুদ্ধোন্মাদনার কারণে, বা একটা দেশের ধনদৌলত লুঠ করার জন্য বহু যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের বিশ্বযুদ্ধ কখনো হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন ১৯১৫ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতে দেখিয়েছিলেন আধুনিক যুদ্ধের কারণ নিহিত থাকে বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির গর্ভে। বিংশ শতকের শুরুতে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করার

সময়ে ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মুষ্টিমেয় শিল্পে উন্নত, অতিবৃহৎ লগ্নিপুঁজির (finance capital) শক্তিতে বলিয়ান সাম্রাজ্যবাদী দেশ গোটা বিশ্বকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল উপনিবেশ হিসাবে। এই উপনিবেশ শুধু দেশ দখল নয়, তাদের অতিবৃহৎ শক্তিশালী লগ্নিপুঁজি খাটানো, সেইসব অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সস্তা শ্রমশক্তিকে মুনাফার স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য। আবার তুলনামূলকভাবে পরে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছিল, অতি উন্নত প্রযুক্তি এবং বিরাট লগ্নিপুঁজির বিকাশ ঘটেছিল জার্মানিতে, কিন্তু তাদের পুঁজি খাটানোর জায়গা ছিল না। তাই আগে থেকে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে দখল হয়ে থাকা বিশ্ববাজারের নতুন করে পুনর্বিন্যাস (redivision of already divided world market), তাদের লগ্নিপুঁজি খাটানোর প্রয়োজনে বাজার দখলের জন্যই প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়, ইংলন্ড-ফ্রান্সের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির তাকে অতি অন্যায্য ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে বেঁধে ফেলার মধ্য দিয়েই যুদ্ধ শেষ হবে না। লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদের যুগে যুদ্ধের অনিবার্য্যতা'র নীতি তুলে ধরলেন এবং আবারও বাজারের পুনর্বিন্যাসের জন্য এই রকমই বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। লেনিন আরো দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের যুগ, যুদ্ধের সম্ভাবনার সাথে সাথে, বিশ্বের দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবের সম্ভাবনাকেও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেনিনের বিশ্লেষণের সঠিকতাই প্রমাণ করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া! আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘুর্নাবর্তের মধ্যে চীন অনেকদুর এগিয়ে যায় বিপ্লবের দিকে, এবং ১৯৪৯ সালে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে। এছাড়াও ইউরোপে পূর্ব জার্মানি, রুমানিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি ৯টি দেশে, এশিয়ায় ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয় বিপ্লবভীতি থেকে

প্রথম মহাযুদ্ধে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ যারা বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ দখল করে রেখেছিল, তাদের কাছ থেকে বাজার ছিনিয়ে নেওয়া, অর্থাৎ বিশ্ববাজারের পুনর্বিন্যাসের জন্য লড়েছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, প্রধানত জার্মানি। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবেই দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, প্রমাণ করেছিল যে মার্কসের উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব নিছক তাত্ত্বিক বিতর্কের বিষয় নয়, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের জন্য শ্রমিক বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র একটা বাস্তব বিপদ। একদিকে যেমন এর প্রভাবে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল, অপরদিকে তা বিশ্বের দেশে দেশে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মনে সৃষ্টি করেছিল প্রবল বিপ্লবভীতি। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়, সে দেশের অভ্যন্তরে তীব্র আর্থিক সংকটকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি এসব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লিয়েবনেক্ট এবং রোজা লুক্সেমবুর্গের নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু তার পরেও গোটা বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বিশেষত ১৯২৩ সাল পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। জার্মানি এবং ইটালি উভয় দেশেই যেকোনও মুহূর্তে বিপ্লব হয়ে যাবে এইরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত জার্মানির শাসকশ্রেণি বিপ্লবের ভূত দেখতে থাকে। এই সময় জার্মানিতে 'জাতীয় সমাজতন্ত্রের' (national socialism) শ্লোগান এবং এর সাথে উগ্র নর্ডিক জাত্যাভিমান, আর্যগরিমা এবং ইহুদি বিদ্বেষের সংমিশ্রনে বিপ্লবমুখি জনগণকে বিভ্রান্ত করে পক্ষে টেনে, সংকটগ্রস্ত এবং বিপ্লবভীত জার্মান শাসকশ্রেণির ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল হিটলার। ভার্সাই সন্ধির 'অবমাননা' থেকে দেশকে মুক্ত করার ডাক দিয়ে, আহত জার্মান জাত্যাভিমানকে উসকে দিয়ে, এবং প্রথম মহাযুদ্ধে হারানো বিভিন্ন এলাকা পুনরুদ্ধারের উন্মাদনা, এসব সৃষ্টি করে সে গোটা দেশকে সামরিক পুনর্গঠনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর আয়তন বাড়িয়ে, সমরশিল্পে (war industry) বিনিয়োগ বাড়িয়ে, বেসরকারি শিল্পের রাষ্ট্রিয়করণ করে সে তখন বেকার সমস্যার আপাত সমাধান এবং সাময়িকভাবে হলেও কৃত্রিমভাবে বাজারে তেজী ভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই সে দেশের মধ্যবিত্ত যুব সম্প্রদায় এবং শ্রমিক শ্রেণির একটা অংশ এবং বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করেছিল। এই পদ্ধতিতে হিটলার ক্ষমতায় এসেই, যে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, সেই জনগণকে জাতীয় সমাজতন্ত্রের উন্মাদনায় মাতিয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট নিধনের কাজে লাগিয়েছিল। প্রায় একই রকম পরিস্থিতিতে একই কায়দায় ইতালিতে মুসোলিনির অভ্যুত্থান

ঘটেছিল। দেশের অভ্যন্তরে সম্ভাব্য বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্যই ইটালি এবং জার্মানি উভয় দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি মুসোলিনি এবং হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

হিটলারের আসল শত্রু ছিল কমিউনিজম

অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের দখল হয়ে থাকা বাজারের পুনর্বন্টন (redivision of already divided world market) তার অন্যতম লক্ষ্য হলেও হিটলার বা ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলোর আসল শত্রু ছিল কমিউনিজম। হিটলার তার আত্মজীবনী মাইনে কাম্ফ (Meine Kampf)-এ বলে, ইউরোপে নতুন জমি দখল করতে হলে প্রধানতঃ যে নামটা আসে তাহল রাশিয়া এবং তার সীমান্তে অবস্থিত তার অধীনস্থ রাজ্যগুলো। আমার নিয়তিই যেন আমাকে ঐ দিকে টানছে।... পূর্বের এই বৃহৎ দেশ ধ্বংস হওয়ার জন্য তৈরি। রাশিয়ায় ইহুদি প্রাধান্যের অবসান মানে রাষ্ট্র হিসাবেও রাশিয়ার অবলুপ্তি। "When we speak of new territory in Europe today we must think principally of Russia and her border vassal states. Destiny itself seems to wish to point out the way to us here... This colossal in the East is ripe for dissolution, and the end of the Jewish domination in Russia will also be the end of Russia as a state."

হিটলার সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তার প্রধান শত্রু যে কমিউনিজম একথা বুঝতে ইংলন্ড বা আমেরিকার পুঁজিপতিদের অসুবিধা হয়নি। বাস্তবে জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের যখন অভ্যুত্থান হয় তখন তার পিছনে শুধু জার্মান বৃহৎ পুঁজির সমর্থন ছিল তাই না; তার পেছনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা সহ সমস্ত বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সুস্পষ্ট মদত ছিল। যার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পরের অবমাননাকর ভার্সাই সন্ধিচুক্তি দিয়ে ফ্রান্স এবং ইংলন্ডের কোটিপতিরা জার্মানিকে বেঁধে ফেলেছিল। কিন্তু নবজাত সোভিয়েত রাশিয়া ১৯২২ সালে এই ভার্সাই চুক্তির দাসত্বমূলক শর্তগুলির বিরোধিতা করে বলেছিল এগুলো অন্যায্য এবং এগুলো শেষ পর্যন্ত আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দেবে! তখন ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নেতারা এই সতর্কবাণীতে কান দেয়নি বরং জারের রাশিয়া যেহেতু প্রথম মহাযুদ্ধে যুক্ত ছিল তাই তখনকার সোভিয়েত রাশিয়ার উপরেও যুদ্ধের ক্ষতিপুরণের বোঝা চাপিয়েছিল। কিন্তু হিটলারের অভ্যুত্থানের পর সে যখন ভার্সাই চুক্তির একের পর এক ধারাগুলিকে অগ্রাহ্য করেছে, তখন ফ্রান্স এবং ইংলন্ডের পুঁজিপতিরা হিটলারকে তোষণ করতে এবং পরোক্ষভাবে মদত দিতে থাকে। এই সময় অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে '৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন বৃহৎ মার্কিন পুঁজিপতিরা তাদের বিরাট অংকের পুঁজি (কমপক্ষে ১০০ কোটি ডলার), জার্মানিতে অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, যা হিটলারকে অস্ত্র বলে বলিয়ান হতে সাহায্য করে। বৃটিশরা হিটলারকে অত্যন্ত শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। এই সময় বড় বড় মার্কিন প্রাইভেট ব্যাংক মোট ১৮২ মিলিয়ন ডলার জার্মান শিল্পসংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়েছিল এবং এই জার্মান পুঁজিপতিরা হিটলারকে মদত দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, কমিউনিজমকে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য। জার্মানিতে লোহার আকরিক কম ছিল, ফরাসি সরকার এই সময় ফ্রান্সের লোরেন প্রদেশ থেকে বিপুল পরিমান লৌহ আকরিক জার্মানিকে সরবরাহ করে যার প্রায় পুরোটাই হিটলার অস্ত্রনির্মাণে ব্যবহার করে। (তথ্যসূত্র- ২য় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খন্ড, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়)

রাশিয়া রক্ষার জন্য স্ট্যালিনের সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতায় এলে, লেনিন এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্ট্যালিন, শুরু থেকেই বুঝেছিলেন এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া একক হলেও গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক মারাত্মক বিপদের উৎস। তাই যে কোনও মুহূর্তে একক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়াকে ধ্বংস করা, সমাজতন্ত্রকে নির্মূল করার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে! এই পরিস্থিতিতে একক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্গঠন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির রাশিয়ার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য স্ট্যালিন শুরু থেকেই কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেমন, (১) কুটনৈতিক প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতাকে কাজে লাগানো। তার জন্য, তাদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি, শান্তি চুক্তি, বন্ধুত্বমুলক চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি, সামরিক সহযোগিতা চুক্তি প্রভৃতি করে, যাতে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে না দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা করা; এক্ষেত্রে বিশ্বজনমতকেও

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে কাজে লাগানো। (২) দ্রুত জনগণকে যুক্ত করে রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। (৩) বহুভাষা, বহু ধর্ম এবং জাতিসত্ত্বার দেশ রাশিয়ায় জাতি, ধর্ম, ভাষাগত বিভাজনকে দূর করে, দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত ধরনের বিভেদকামী এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শক্তিগুলিকে উচ্ছেদ করে গোটা দেশের জনগণকে এক মানুষের মতো দাঁড় করানো। (৪) জনগণের মধ্যে এই দেশ আমাদের, একে আমাদের গড়ে তুলতে এবং রক্ষা করতে হবে এই আবেগ এবং একাত্মতাবোধ সৃষ্টি করা।

আভ্যন্তরীণ বিভেদকামী শক্তির উচ্ছেদ

দলের অভ্যন্তরে এবং দেশের অভ্যন্তরে নানান বিভেদকামী ও ষড়যন্ত্রকারী শক্তিকে উচ্ছেদ করা; খ) বহু ভাষা, ধর্ম; বহু জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত দেশ জারের রাশিয়াকে আদর্শের ভিত্তিতে এবং সর্বহারা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা- এইটি ছিল বহু ভাষা, বহু ধর্মের দেশ সোভিয়েত রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিপ্লবের আগে থেকেই স্ট্যালিন এই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন, দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে মার্ক্সবাদী বিচারধারা এবং মহান লেনিনের শিক্ষার আলোকে দেখে জাতিসত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 'right of the nations to self determination'-এর নীতিগুলিকে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের পরেই লেনিন বর্ণিত এই নীতি গৃহিত হয় এবং স্তালিনকে জাতিসমস্যা সংক্রান্ত কমিশার (Commisar for Nationalities) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সময় সমস্ত জাতিসত্বা, যেগুলি জারের আমলে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে থাকা, অথবা স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার। ফিনল্যান্ড রুশ সাম্রাজ্যের অধীনস্ত রাজ্য ছিল। ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জারের পতন হলে ফিনল্যান্ড স্বাধীনতা চায়। তৎকালীন কেরেন্সকি সরকার তা দিতে অস্বীকার করে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা এরাও ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পরে স্ট্যালিন ফিনল্যান্ডকে তাদের দাবীমত স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব তোলেন এবং সোভিয়েত সরকার তা মঞ্জুর করে! সোভিয়েত রাষ্ট্রের ১৯২২ সালের প্রথম সংবিধান রচনা করেন স্তালিন, সেখানে কোন জাতিসত্বাকেই জোর করে ধরে না রেখে তাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একত্রিত এবং সম্মিলিত রাখা হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার গঠন পর্বে জাতিদাঙ্গা, ভাষা বা ধর্ম বর্ণকে কেন্দ্র করে বিভাজন, যা জারের রাশিয়ায় প্রবলভাবে ছিল, সেসব মুছে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন পর্বে দেশের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে এক মানুষের মতো দাঁড় করানো গিয়েছিল। এরপরে ১৯৩৬ সালে, দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল হওয়ার পরে, এবং দেশের অভ্যন্তরে এবং দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দেশের স্পাই, ষড়যন্ত্রকারী এদের চিহ্নিত করে শুদ্ধিকরণের কাজ (Great Purge) অনেকটা এগোনোর পরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান গোটা দেশের সমস্ত জনগনকে যুক্ত করে পাশ করান। ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে সমাজতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া অনেকটা এগোনোর পর সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরের পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন সংবিধান প্রবর্তন করতে হবে। ৩১জন বিশেষজ্ঞের নিয়ে গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্ট্যালিন। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে খসড়া তৈরি হলে তার ৬ কোটি কপি ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। এই সংবিধান নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভা হয়, তাতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ১ লক্ষ ৫৪ হাজার সংশোধনী প্রস্তাব আসে। তার মধ্যে থেকে বেশ কিছু সংশোধনী গৃহিত হয়। তারপর ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বরে সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংবিধান গৃহিত হয়। লক্ষ্যণীয় হল এই সময় দেশে 'গ্রেট পার্জ' যা নিয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বে প্রবল হইচই হয়েছে, সেই সময় জনগণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দিপনার সঙ্গে এই সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় সোভিয়েত রাশিয়ায় নতুন ধরণের 'গণতন্ত্র' দেশের মানুষের ঐক্য-সংহতিকে সমস্ত দিক থেকে দৃঢ়তর করতে সাহায্য করেছিল!

আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের জন্য স্ট্যালিন বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, বিশেষতঃ ইউরোপ-এশিয়ায় যুদ্ধবাজ ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির অভ্যুত্থান এবং বনেদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হিটলার তোষণ এবং তাকে নানাভাবে রাশিয়ার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা, স্ট্যালিন অনেক আগে থেকেই লক্ষ করছিলেন। একক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চারিদিকে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী

রাষ্ট্রগুলি যাতে একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে (total imperialist encirclement) তার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে তীব্র দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইউরোপে ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য নানান দেশের সঙ্গে মিত্রতা বা সামরিক সহযোগিতা চুক্তি, অনাক্রমণ চুক্তি এসব করে, যুদ্ধ বন্ধ রাখার পক্ষে এবং শান্তির স্বপক্ষে বিশ্বজনমতকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারি প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে স্ট্যালিনের সতর্কবাণীকে উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল, ''We must be ready at any moment to repel an armed attack on our country, and to smash and finish off the enemy on his own territory.'' (Russia at War, Alexander Werth)

হিটলারের নেতৃত্বে কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি

১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বর জার্মানি ও জাপান কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৩৭ সালের ৬ই নভেম্বর ইটালিও সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমস্ত রকম কার্যকলাপের যুক্তভাবে বিরোধিতা করা। এতে বৃটেন, ফ্রান্স আমেরিকার শাসকরা খুশি হয় এবং এই জোটকে নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে শক্তিশালী করে, সোভিয়েত বিরোধিতার দিকে ঠেলে দিতে থাকে। এই চুক্তির আগেই ১৯৩১ সালে সাম্রাজ্যবাদী জাপান বলশেভিজমের বিপদকে প্রতিহত করার কথা বলে রাশিয়ান সীমান্তে অবস্থিত চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এশিয়ায় জাপানের আগ্রাসন ছিল আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে আন্তর্সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার এবং জার্মানির আত্মসমর্পনের পরে বার্লিনের জার্মান সরকারি মহাফেজখানা থেকে যে কাগজপত্র উদ্ধার হয় তাতে দেখা যায় ১৯৩৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ব্রিটেনের লর্ড চ্যান্সেলর হ্যালিফ্যাক্স (যিনি পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন) ওবারস্যালসবার্গে হিটলারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ''ফ্যুরার (হিটলার) তার নিজদেশে কমিউনিজম ধ্বংস করিয়া পশ্চিমদিকে এই মতবাদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার মনে করেন যে, পশ্চিম ইউরোপে বলশেভিজম প্রতিরোধের পক্ষে জার্মানি একটি দুর্গস্বরূপ''। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪)।

মিউনিখ চুক্তির বিশ্বাসঘাতকতা

হিটলার '৩০-এর দশকের শুরু থেকেই চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি প্রদেশ 'সুদেতেন ল্যান্ড', যেখানে ভাল সংখ্যক জার্মান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ছিল, সেই প্রদেশ জার্মানির অঙ্গীভূত করার দাবি করতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে, ১৯৩৮ সালে, ফ্রান্স এবং ইংলন্ড, জার্মানি এবং ইটালির সঙ্গে মিউনিখ চুক্তি করে, যার মধ্য দিয়ে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করে, সে দেশের একটা অঙ্গরাজ্য, সুদেতেনল্যান্ড, জার্মানির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে ফ্রান্স এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আলাদা আলাদা মিত্রতা এবং সামরিক সহযোগিতা চুক্তি ছিল। সেখানে শর্ত ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হলে ফ্রান্স আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সামরিক সাহায্যে এগিয়ে গেলে, পরে সোভিয়েত রাশিয়াও চেকোশ্লোভাকিয়ার সমর্থনে এগিয়ে যাবে। আবার ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যেও মিত্রতা এবং সামরিক সহযোগিতা চুক্তি ছিল। কিন্তু মিউনিখ চুক্তিতে হিটলারের আপত্তির জন্যই সোভিয়েত রাশিয়াকে ডাকা হয়নি, এবং চেকোশ্লোভাকিয়ারও মতামত নেওয়ার কোনো চেষ্টা হয়নি। স্ট্যালিনের নির্দেশে তৎকালীন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভ ১৭ই মার্চ ১৯৩৮ তারিখে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত রাশিয়ার একটি সম্মেলন বা যুক্ত বৈঠক আহ্বান করেন এবং সেখানে এই চারটি দেশের যৌথ প্রতিরক্ষানীতি গ্রহণ করা এবং জার্মানির চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের চেষ্টায় বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। স্ট্যালিন কলঙ্কজনক মিউনিখ চুক্তির উদ্দেশ্য যে জার্মানিকে শক্তিশালী করা এবং তাকে পুর্বদিকে অর্থাৎ রাশিয়ার দিকে আরো ঠেলে দেওয়া, এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে, যখন জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করছে তখন চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করতে সোভিয়েত লালফৌজ পাঠাতে চেয়েছিলেন; এবং তার জন্য পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির কাছে তাদের সীমানা কিছুটা পার হয়ে সৈন্য পাঠানোর অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানত ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের চাপে এই দেশগুলির সরকার সেই অনুমতি দিতে রাজি হয়নি! এই চুক্তিকে কাজে লাগিয়ে হিটলার কিছুদিনের মধ্যেই শুধু সুদেতেনল্যান্ড নয়, গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে এবং ইউরোপের বৃহত্তম অস্ত্র কারখানা স্কোডা (Skoda)-সহ অতি উন্নতমানের আরও ২৩টি কারখানা তার দখলে নিয়ে আসে।

বাস্তবে এই চুক্তি করার সময়ই ব্রিটেন-ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপে কমিউনিজমের প্রসার ঠেকানোর জন্য জার্মানি-ইটালি জোটকে নানাভাবে শক্তিশালী করে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। এর কিছুদিন পরে ১৯৩৯ সালে হিটলার 'লীগ অফ নেশনস' যা রাষ্ট্রপুঞ্জের তৎকালীন রূপ, তাকে মানতে অস্বীকার করে। বৃটেন, ফ্রান্স যারা তখন লীগ অফ নেশনসের মাথা, তারা চুপ করে থাকে। কিন্তু স্ট্যালিনের রাশিয়া লীগ অফ নেশনসের সদস্য ছিল না, রাশিয়া এই সময় সদস্যপদ নেয় এবং লীগ অফ নেশনসে জার্মানির যুদ্ধপ্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য সমবেত সিদ্ধান্ত করানোর প্রচেষ্টা শুরু করে।

জার্মানিকে তোষণ সম্বন্ধে স্ট্যালিনের সতর্কবার্তা

১৯৩৯ সালের সিপিএসইউ-এর ১৮তম কংগ্রেসে স্ট্যালিন হিটলারের প্রতি ইংলন্ড-ফ্রান্স-আমেরিকার আপসমুখি, তোষণকারী মনোভাব যে তাদের স্বার্থকেই বিপন্ন করবে সে কথা বলেন এবং তাদের ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলেন, ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা এই দেশগুলি জার্মানি প্রভৃতি আক্রমণাত্মক রাষ্ট্রগুলিকে জায়গা ছাড়ছে। যার ফলে জার্মানির মতো যুদ্ধবাজ দেশগুলো এইভাবেই বিশ্ববাজারের পুনর্বিন্যাসের দিকে যাচ্ছে এবং বৃহৎ শক্তিগুলি কিছুটা ষড়যন্ত্রমূলক গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমেই তাদের নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে, প্রতিরোধের কোনও চেষ্টা না করে, এদের একের পর এক সুবিধা দিচ্ছে। হয়ত এর কারণ তারা মনে করছে প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল। আবার যদি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে আরও বেশ কিছু দেশে বিপ্লব সফল হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে তারা ভীত! "The war is being waged by aggressor states, who in every way infringe upon the interests of the non-aggressive states, primarily England, France and the U.S.A., while the latter draw back and retreat, making concession after concession to the aggressors.

Thus we are witnessing an open redivision of the world and spheres of influence at the expense of the non-aggressive states, without the least attempt at resistance, and even with a certain amount of connivance, on the part of the latter.... To what then are we to attribute the systematic concessions made by these states to the aggressors.

It might be attributed, for example, to the fear that a revolution might break out if the non-aggressive states were to go to war and the war were to assume world-wide proportions. The bourgeois politicians know, of course, that the first imperialist world war led to the victory of the revolution in one of the largest countries. They are afraid that the second imperialist world war may also lead to the victory of the revolution in one or several countries." (*Speech at the 18th Congress of CPSU, 1939*) লক্ষ্যণীয় এই বক্তব্যের মধ্যেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে aggressive এবং non-aggressive এই দুভাগে ভাগ করেছেন। এবং এই সতর্কবার্তার সাথে ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি তথাকথিত non-aggressive রাষ্ট্রগুলির কাছে বার বার ফ্যাসিস্ট জার্মানির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দিক থেকে সাড়া না পেয়ে, এবং তাদের, বিশেষত ইংলন্ডের দিক থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে জার্মানিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার নানান কুটনৈতিক চাল দেখে, ক্রমশ ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী রাশিয়ার দিকে এগোচ্ছে বুঝতে পেরে, উপায়ান্তর না দেখে স্ট্যালিন ১৯৩৯ সালের ২৯ শে আগষ্ট জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেন, যা মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি বলে পরিচিত। এই চুক্তির প্রস্তাব এসেছিল জার্মানির দিক থেকেই। জার্মান প্রস্তাবে বন্ধুত্ব এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্বের প্রশ্ন নেই, তাই চুক্তির ঐ ধারাগুলি বাতিল করে স্ট্যালিন জার্মানির সঙ্গে শুধু ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি করেন। স্টালিন এই চুক্তি করেছিলেন এটা জেনেই যে জার্মানি এই চুক্তি মানবে না এবং যেকোনো সময় চুক্তিভঙ্গ করে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করবে। সোভিয়েত বিরোধী পশ্চিমি সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ বা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই চুক্তির জন্য স্ট্যালিনকে নানাভাবে সমালোচনা করেন, কিন্তু তারা বেশিরভাগ ফ্রান্স এবং ইংলন্ডের নেতৃত্ব যে সমস্ত নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হিটলারের জার্মানিকে বিভিন্ন দেশ বা স্বাধীন দেশের অংশ দখল করতে সাহায্য করছিল এবং ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তা নিয়ে এরা একটি কথাও বলেন না। এই চুক্তির কিছুদিনের মধ্যেই জার্মানি পোল্যান্ড দখল করে নেয়। ১৯১৭'র নভেম্বর বিপ্লবের পরে শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য ইউরোপের প্রায় ১৪টা দেশ জারের আমলের বিভিন্ন

সেনাপতিদের সামনে রেখে যে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ চলছিল, সেই সময় কোনও ঘোষণা ছাড়াই এই যুদ্ধে যোগ দেয়। সে সময় পোল্যান্ড রাশিয়ার বেশ কিছুটা অংশ দখল করে নিয়েছিল। ১৯৩৯ শে জার্মানি যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে তখন সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যান্ডকে সামরিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু পোল্যান্ডের সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। তারপর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে অতি দ্রুত দখল করে নেয় এবং পোলিশ সরকারের পতন ঘটে। যখন পোল্যান্ডে কোনও সরকার ছিল না সেই সময় স্ট্যালিন লালফৌজের কয়েকটি ডিভিশন পাঠিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে পোল্যান্ড রাশিয়ার যে অংশ দখল করেছিল, সেই অংশ নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং জার্মান বাহিনীর আরো পূর্বদিকে অর্থাৎ রাশিয়ার দিকে এগোনোর পথ বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে আমেরিকা, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এবং ইংলন্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্র, জার্মানির পোল্যান্ড দখল নিয়ে বিশেষ কিছু না বললেও রাশিয়ার পোল্যান্ডে সৈন্যচালনা নিয়ে প্রবল হৈচৈ শুরু করে। কিন্তু জর্জ বার্নার্ড শ রাশিয়ার পোল্যান্ডে ঢুকে জার্মানির অগ্রগতিকে রুখে দেওয়ার প্রশংসা করে লন্ডন টাইমসে 'থ্রি চিয়ার্স ফর স্ট্যালিন' বলে অভিনন্দন জানান। চার্চিলও তার কুটবুদ্ধি দিয়ে এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন, রাশিয়া হিটলারের পূর্বদিকে অগ্রগতি সঠিকভাবেই আটকে দিল! পোল্যান্ডে রুশ অধিকৃত অংশে স্থানীয় জনসাধারণ রুশ বাহিনীকে ট্যাংকের নলে মালা পরিয়ে স্বাগত জানায়!

যুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে

পশ্চিমা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকাকে বিকৃত করে এবং ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করে এবং পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইতিহাসবিদরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় একান্তভাবে ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি মিত্রশক্তির দেশগুলির নেতৃত্বেই হয়েছে। আবার অনেকে বলে রাশিয়া জিতেছে রাশিয়ার ভয়ঙ্কর শীত, এবং স্তেপ অঞ্চলের মারাত্মক কাদার জন্য। তারা যুদ্ধজয়ের কৃতিত্বটা 'সেনাপতি শীত' আর 'সেনাপতি কর্দমকে' দিতে চেয়েছে। কেউ নেপোলিয়ানের রাশিয়ার মাটিতে পরাজয়ের সঙ্গে হিটলারের এই পরাজয়কে তুলনা করেছে। সুপরিচিত লেখক উইলিয়াম এল শ্যিরার তার Rise and Fall of Third Reich বইতে বলেছেন, হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে একমাস দেরি করার জন্যই যুদ্ধের ফল এরকম হল। অর্থাৎ এই দেরির ফলে দ্রুত শীত এসে গিয়েছিল, এবং তার মতে একমাস আগে শুরু হলে যুদ্ধের ফলাফল নাকি অন্যরকম হত! কিন্তু বাস্তবে ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস কী?

১৯০৫ সালে ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান বৃহৎ জারের রাশিয়াকে পরাস্ত এবং পর্যুদস্ত করে। ১৯৪১-'৪৫ সালে রাশিয়ার কী রূপান্তর ঘটেছিল যাতে যে জার্মান বাহিনী ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রভৃতি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে যুদ্ধে উড়িয়ে দিয়ে গোটা ইউরোপ দখল করার পর যখন গোটা পশ্চিম ইউরোপের বিশাল ও অতি উন্নত উৎপাদন যন্ত্র তাকে অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খাদ্য এবং সমর সম্ভার সরবরাহ করছে, সেই শক্তি নিয়ে জার্মানি রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নতুন গড়ে ওঠা সোভিয়েত রাশিয়া কোন শক্তিতে সেদিনের 'অপ্রতিরোধ্য' জার্মানিকে রাশিয়ার মাটিতে পর্যুদস্ত করেছিল, এটা বিচার করে দেখা দরকার।

জার্মানরা ভেবেছিল রুশ জনগণ তাদের স্বাগত জানাবে

শুধু জার্মান সেনানায়ক নয় আমেরিকার সরকারি কর্তাদেরও ধারণা ছিল জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করলেই স্ট্যালিনের 'অত্যাচারে জর্জরিত রুশ জনগণ' জার্মানির পক্ষ নেবে! রাশিয়া আক্রমণের শুরুতে হিটলারের সেনাপতিদের মনোভাব বর্ণনা করে এক যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন, "Hitler and his top advisers had naively expected their armies to be welcomed as liberators by the Russians, repressed as they were, under Stalin's chilling regime." *The Blunder of Barbarossa, Michael D. Hull* থেকে উদ্ধৃত) এক ফরাসি বিশেষজ্ঞ Jean Bruller Vercours বলেছিলেন, হিটলারের বাহিনী মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো রাশিয়ার প্রতিরোধ ভেদ করে এগিয়ে যাবে। "Hitler's legions will go through the country, 'like a knife into butter'" (ibid) কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল ঠিক তার উল্টো। জার্মান সেনাপতিদের কেউ কেউ হিটলারকে বলেছিল রাশিয়াকে পরাস্ত করতে বড়জোর ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ লাগবে! হিটলারের চিফ অফ স্টাফ জেনেরাল হালডার তার ডায়েরিতে লিখেছিল, ১৯৪১-এর জুনের শুরুতে রাশিয়া আক্রমণের চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দেওয়ার সময় হিটলার বলেছিল ৫ মাসের মধ্যে গোটা রাশিয়া দখল এবং ধ্বংস করে দিতে হবে। ১৯৪১ সালের ৬ই জুন হিটলার কুখ্যাত 'কমিশার অর্ডার' (Commissar Order)

জারি করে। এই আদেশের সার কথা ছিল, রাশিয়া অভিযানে দখল করার থেকেও বেশি গুরুত্ব পাবে হত্যা করা, ধ্বংস করা বা রাশিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করা। রাশিয়ার জার্মান অধিকৃত এলাকায় বা যে কোনো জায়গায়, কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সদস্য বন্দি হলে, বা এলাকায় তাদের খুঁজে বার করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতে হবে। বাকি সাধারণ রাশিয়ানদের হয় হত্যা করতে হবে না হয় তাদের কাছ থেকে সমস্ত খাদ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম লুঠ করে নিতে হবে যা জার্মান সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগবে; তাতে প্রয়োজনে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ না খেয়ে মরবে! হিটলার রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা তার সেনাপতিদের কাছে ব্যাখ্যা করার সময় বলেছিল, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মধ্যযুগের নাইটদের মতো ঔদার্য দেখিয়ে হবে না। এখানে রয়েছে মতাদর্শগত এবং জাতিগত পার্থক্য। যার ফলে অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতা, এবং অন্তহীন কঠোরতার মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। "The war against Russia will be such that it cannot be conducted in knightly fashion. This struggle is one of ideologies and racial differences, and it will have to be conducted with unprecedented, unmerciful and unrelenting harshness"। হিটলারের সেনাপতিরা যুদ্ধে নেমে রাশিয়ানদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে হিটলারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে অন্যান্য দেশের থেকে অনেক বেশি অকল্পনীয় বর্বরোচিত অত্যাচার করেছিল।

জার্মানির আক্রমণ, স্ট্যালিনের প্রতিরোধ

যুদ্ধের শুরুতে কয়েকদিন জার্মান বাহিনী রাশিয়ার ভিতরে বেশ কিছুটা ঢুকে যায়। এই ঘটনা দেখে কেউ কেউ বলেছেন স্ট্যালিন জার্মান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি ১৯৫৬ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভও স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার সময় এই অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্ট্যালিন অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। হিটলারের জার্মানি যে আক্রমণকারী, রুশ জনগণ, যারা বরাবর শান্তির পক্ষেই ছিল, তারা যে আক্রান্ত, এটা বিশ্বের মানুষের কাছে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। হিটলার এবং তার প্রচারযন্ত্র বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করার সময় নানান অপযুক্তি এবং অজুহাত সৃষ্টি করে সেই দেশকেই আক্রমণকারী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। লালফৌজ শুরু থেকেই প্রতিরোধ করলেও হিটলারের বিশাল বাহিনী রাশিয়ার বেশ কিছুটা অংশ দখল করতই, কিন্তু হিটলারের প্রচারযন্ত্র এই ধরনের মিথ্যা প্রচার করার সুযোগ পেতে পারত, এবং পশ্চিমা দেশগুলির শাসকবর্গ যারা চাইছিল হিটলার রাশিয়া ধ্বংস করুক, তারাও হিটলারের প্রচারকে সমর্থন করত। এতে বিশ্ব জনমত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অপারেশন বারবারোসা শুরু হয় ২২ জুন ১৯৪১-এ, স্ট্যালিন দেশের জনগণের জন্য প্রথম বেতার ভাষণ দেন ৩রা জুলাই। তিনি স্বীকার করলেন, "আমাদের দেশের কিছুটা অংশ যে ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী দখল করেছে তার প্রধান কারণ এই যে অবস্থায় জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল তা জার্মানির পক্ষে অনুকুল এবং সোভিয়েতের পক্ষে প্রতিকুল ছিল। জার্মানি তখন যুদ্ধরত অবস্থায়, তার সমরায়োজন আগে থেকেই সম্পূর্ণ ছিল, তারা শুধু নির্দেশের জন্য প্রতিক্ষা করছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনীকে তখনও সমাবেশ করা হয়নি। তখনও তারা সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছায়নি। ১৯৩৯ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, জার্মানি একান্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে তা লঙ্ঘন করে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় সাফল্য লাভে এরও গুরুত্ব কম নয়। এই চুক্তিভঙ্গের জন্য সমগ্র জগৎ যে জার্মানিকে আক্রমণকারী রূপে গণ্য করবে এই চিন্তাও তাকে বিচলিত করেনি। আমাদের দেশ স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়, কাজেই আমরা এই চুক্তিভঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনি।" তিনি আরও বললেন, "জার্মানি আমাদের দেশে সাময়িকভাবে অল্প কিছুদিনের জন্য কিছু সুবিধাজনক ঘাঁটি অর্জন করতে পেরেছে, কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়ে সে গোটা বিশ্বের কাছে রক্তলোলুপ আততায়ীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানির সুবিধা স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া যে বিপুল সুবিধা পেয়েছে তার স্থায়ীত্ব অনেক বেশি।" অর্থাৎ বিশ্বের জনসমর্থন সোভিয়েত রাশিয়াই পাবে। বাস্তবে ইংলন্ডের শাসকশ্রেণি যতটা হিটলারের ফ্যাসিজম বিরোধী তার থেকে অনেক বেশি কমিউনিজম বিরোধী। যার ফলে তারা কোনোমতেই জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে যেতে চাইছিল না। কিন্তু সেদেশের জনগণ প্রবলভাবে চাইছিল জার্মানির বিরুদ্ধে ইংলন্ড এবং রাশিয়ার মিত্রতা চুক্তি হোক। ১৯৩৯ সালে ইংলন্ডের একটা জনমত সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৪ শতাংশ লোক চেয়েছিল জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের জোট হোক (তথ্যসূত্র- *Russia at War, Alexander Werth*)। ১৯৪০ সালে ডানকার্কের ঘটনার পরে এবং ১৯৪১ এ চুক্তিভঙ্গ করে জার্মানির রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে

আক্রমণ এবং ধ্বংস শুরু হবার পর ব্রিটেন এবং আমেরিকার উপর গোটা বিশ্বের এবং তাদের নিজের দেশের জনমতের চাপ বাড়তে থাকে জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা এবং সামরিক সহযোগিতা করার জন্য। যার ফলে জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করার পরেই, কার্যত প্রবল জনমতের চাপে রাশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ড এবং আমেরিকার মিত্রজোট গড়ে ওঠে এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একজোট হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে -এই বিপদকে এড়ানো সম্ভব হয়। এটাই ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী লাভ, যার কথা স্ট্যালিন বলেছেন। যদিও প্রায় শেষ পর্যন্ত জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইটা রুশ জনগণকে একাই লড়তে হয়, কিন্তু বিশ্ব-জনমত তাদের পক্ষে যায়।

সোভিয়েত লালফৌজ ছিল ভিন্ন চরিত্রের

সোভিয়েত লালফৌজও ছিল চরিত্রগতভাবে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সৈন্যবাহিনীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাহিনী। ১৯১৭-এর নভেম্বর বিপ্লবের সময় থেকে ১৯২০ পর্যন্ত ১৪টা রাষ্ট্রের ঘোষিত এবং অঘোষিত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় পর্যন্ত স্ট্যালিন নিজে এই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে লেনিনের শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। এই পার্থক্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ইংলন্ড এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশের সামরিক বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন। যেমন যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ সালে ইংলন্ডের সমর বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স ওয়ার্নার, তার Military Strength of the Powers, নিবন্ধে বলেছিলেন, ''The Red army is a political army, it gives the soldier a political education and moulds his general social outlook. The relation of the party and the army in the Soviet Union is very different from that which prevails under a Fascist dictatorship... the Bolshevik party created the Red army, it did not take it over, and a political organisation, a military party organisation, embraces the the whole army from top to bottom and gives its ideological cohesion." (*Max Werner, quoted from TAS Hooper, Soviet Fighting Forces, London, 1942*) এমনকি জার্মান সমর বিশেষজ্ঞরাও, জার্মান 'Deutshe Wehr' পত্রিকায় লিখেছিলেন লালফৌজ এমন একটা বাহিনী যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ থাকার ফলে তার মধ্যে অধস্তন সৈন্যরা কখনো উর্ধতন অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি, যে ধরনের বিদ্রোহ প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের বাহিনীতে কমবেশি হয়ে থাকে। ''Since the existence of the Red army there has been no single case of mutiny, either at the front or behind the lines. The question as to the reliability of the Red soldier in the event of war must be answered in affirmattive." (*Deutshe Wehr, German military publication, from ibid*)

রাশিয়ার যুদ্ধে নাৎসি নেতাদের হিসাব আদৌ মিলল না

জার্মান ঝটিকা বাহিনী রাশিয়ায় এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতার সামনে পড়ে। রাশিয়ান লালফৌজের এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাশিয়ার জনগণের এক মানুষের মতো দাঁড়ানোর এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধের তীব্রতায় তাদের সব হিসাব ওলটপালট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে মাইকেল হাল আরো লিখেছেন, ১৯৪১-এর আগস্টেই হিটলার এবং তার হতচকিত হয়ে যাওয়া সেনাপতিরা স্বীকার করে যে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরোধ শক্তি এবং তার অস্ত্রশস্ত্র কতটা উন্নত তা বুঝতে সম্পূর্ণ ভুল করেছে। তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল যে স্তালিনের নেতৃত্বে দেশে যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল তা এতই উন্নত যে যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিকে অত্যন্ত দ্রুততা এবং দক্ষতার সঙ্গে পূরণ করে দিয়েছে। "In August, Hitler and his stunted propaganda Minister, Joseph Goebbles, admitted that they had obviously underestimated completely Soviet striking power and above all – the equippment of the Soviet Union" They were forced to realize that Stalin's increasingly efficient regime had succeded in creating an untouchable eastern industrial base, which enabled his armies to make good their heavy material losses in the battles of encirclement"।

স্ট্যালিনের অত্যাচার নিয়ে যে ব্যাপক প্রচার চলছিল, তার সাথে রাশিয়ার মানুষের গভীর আবেগের সঙ্গে স্তালিনের নেতৃত্বে এক মানুষের মতো দাঁড়ানো, এটা কোনোমতেই মেলেনি। জার্মানি এবং ইটালির জনগণও হিটলার এবং মুসোলিনির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, যতদিন তারা যুদ্ধে জিতেছে। কিন্তু যখন তারা পরাজিত হয়েছে, পিছু হঠেছে, তখন জনসাধারণের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ায় তা হয়নি। অ্যালেক্সান্ডার ভার্থ, লন্ডনের 'সানডে টাইমস'-এর সাংবাদিক, যিনি কমিউনিজম এবং স্ট্যালিন বিরোধী, যিনি স্ট্যালিনের শাসনকালকে 'barbarous' অর্থাৎ বর্বর বলেছেন, তিনি যুদ্ধের পুরো সময়টা সাংবাদিক হিসাবে রাশিয়ায় ছিলেন। তিনি স্ট্যালিন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন, স্ট্যালিন রুশ জনগণের সকল অংশের মধ্যে নিজেকে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা

করতে পেরেছিলেন। "...he succeeded in getting himself almost universally accepted as Russia's national leader." ...তিনি রুশ জনগণের সম্বন্ধে বলেছেন তারা কখনোই সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং তার প্রতিমূর্তি হিসাবে স্ট্যালিন সম্বন্ধে আস্থা হারাননি, রাশিয়ার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা সোভিয়েত ব্যবস্থার জন্যই লড়াই করেছেন, "...for having shown the greatest power of endurance, and the greatest patience and for never having lost faith in the Soviet regime and by implication, in Stalin himself. This was one way of saying that, in fighting for Russia, the Russian people also fought for the Soviet system..." (Russia at War, Alexander Werth).

দুটি ভিন্ন সমাজব্যবস্থার সংঘর্ষ

বাস্তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হিটলারের জার্মানির পরাজয় শুধু দুটি দেশের যুদ্ধে একটি দেশের পরাজয় নয়; এটা ছিল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লড়াই। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই লড়াইয়ে জয়ী হয়েছিল উন্নততর সমাজব্যবস্থা হিসাবেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ২২ জুন হিটলারের আক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে সোভিয়েত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্টালিন দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন। এই বেতার ভাষণে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণের কাছে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য জীবনপণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধে' পরিণত করার আহ্বান করেন, অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত জার্মান বাহিনী আর ফরাসি বাহিনী অথবা বেলজিয়ামের সৈন্যবাহিনী লড়াই করেছে। কিন্তু স্ট্যালিন বললেন এই যুদ্ধ নিছক দুটো ভাড়াটে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হবে না। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বাজার দখল এবং মুনাফার স্বার্থে যুদ্ধ করে। তাদের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী অস্ত্রের শক্তিতে বলিয়ান কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে আগ্রাসনকারী। তাদের আদর্শের শক্তি নেই, তাদের যুদ্ধ যে 'ন্যায়যুদ্ধ' এই আত্মবিশ্বাস তাদের নেই। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া শুধু অর্থ এবং অস্ত্রের শক্তিতে যুদ্ধ করবে না, এর সঙ্গে যুক্ত হবে আদর্শের শক্তি, যে শক্তির বলে তারা বহু প্রাণদান এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিপ্লব করেছে এবং নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেছে। এটা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজব্যবস্থার যুদ্ধ। এটা হবে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠন-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা, শোষণমূলক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার ন্যায় যুদ্ধ। যার ফলে এই যুদ্ধে জার্মান ভাড়াটে বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়বে সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণ। জার্মানির বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক তাকে পরাস্ত করা সম্ভব এই আত্মবিশ্বাস স্ট্যালিনের ছিল। কিন্তু কমিউনিজম বিরোধিতা থেকে জার্মানি, ইংলন্ড, আমেরিকা একজোট হয়ে গেলে সেটার মোকাবিলা করা রাশিয়ার পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে যেত। বহুদিক ভেবেই স্ট্যালিন প্রতিরোধ শুরু করার সময়টা বেছে নিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী জোট গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাকে আটকে দিয়ে, বিশ্বজনমতকে আক্রান্ত সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে টেনে আনতে পেরেছিলেন। জার্মানি প্রাথমিক কয়েকদিনের অবাধ অগ্রগতির পরে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রতিরোধের সামনে পড়ে গিয়েছিল।

স্ট্যালিনের জনযুদ্ধের আহ্বান

স্ট্যালিন আহ্বান করলেন, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধে' পরিণত করতে হবে। ''Tront is not only where the canon roars, front is at every factory, every farm''। এই পর্যায়ে লালফৌজের সৈন্যরা সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে; আর দেশের জনগণ কলে কারখানায়, শস্যক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে, জরুরি ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনীকে খাদ্য, অস্ত্র, গাড়ি, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য। একদল স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আহতদের চিকিৎসার জন্য কাজ করবে। দ্বিতীয়ত স্ট্যালিন ঘোষণা করলেন 'পোড়ামাটি' নীতি, অর্থাৎ লালফৌজ যেখানে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হবে সেই সব গ্রাম-শহর এলাকা শত্রুর হাতে পড়ার আগে সেখানকার কলকারখানা, খাদ্য সহ সমস্ত সম্পদ সরিয়ে নিতে হবে, এমনকি জলের উৎসগুলিও নষ্ট করে দিতে হবে। জনগণের এক অংশ এই সরিয়ে আনার কাজ করবে, আর এক অংশ স্বেচ্ছায় দখল হয়ে যাওয়া অংশে থেকে যাবে, ধরা পড়লে ভয়ঙ্কর অত্যাচার এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও শত্রু অধিকৃত এলাকায় পিছন থেকে স্যাবোট্যাজ আক্রমণ এবং গেরিলা যুদ্ধ করে শত্রুর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এদের অনেকে ছিল পার্টির এবং কমসোমলের উচ্চস্তরের কর্মী। এছাড়া কমসোমল তৈরি করেছিল আত্মঘাতী বাহিনী বা সুইসাইড স্কোয়াড। এই স্কোয়াডের সদস্যরা গায়ে বোমা বেঁধে নিয়ে ট্যাংকের সামনে শুয়ে পড়ত। আর ট্যাংক তাকে পিষে দেওয়ার সময় বিস্ফোরণে উড়ে যেত।

যুদ্ধে যেতে সক্ষম নয় এমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়

যুদ্ধরত সৈন্যদের জন্য ঘরে বসে উলের পোশাক বুনে পাঠাত। এইভাবে গোটা রাশিয়ার প্রতিটি জনগণ এই যুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য কিছু না কিছু ভুমিকা পালন করেছিল। যার ফলে রাশিয়া দখল করতে গিয়ে হিটলারের বাহিনী প্রথম সর্বাত্মক এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রতিরোধের সামনে পড়ে।

এই প্রতিরোধ কোনও পুঁজিবাদী দেশে সম্ভব ছিল না

সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পর্যায়ে, বিশেষত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সময়ে অত্যন্ত দ্রুত গোটা দেশের জনগণকে যুক্ত করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক অগ্রগতি, সমস্ত ধরণের শিল্প কারখানার অবাধ বিকাশ; শিক্ষা, চিকিৎসাব্যবস্থা এসবের অগ্রগতি ঘটানো; এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুততার সামরিক শক্তিবৃদ্ধি। পুঁজিবাদী দেশে, সাধারণত দেশের 'উন্নয়ন', 'অগ্রগতি' এসব মুষ্টিমেয় নেতা, মন্ত্রী আর সরকারি আমলা অথবা বড়বড় মালিক পুঁজিপতিদের কাজ। পয়সার বিনিময়ে নিজের শ্রম বিক্রি করা ছাড়া শ্রমজীবী জনগণের এই তথাকথিত উন্নয়নে বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না। সাধারণ মানুষ দেখেযে এই তথাকথিত 'উন্নয়নের' সিংহভাগ সুফল দেশের পুঁজিপতিদের গর্ভেই যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নেতাদের অবাধ দুর্নীতি। কোনও পুঁজিবাদী দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্তরে 'দেশপ্রেম' থাকলেও, স্বাধীনতার পরে 'এই দেশটা আমার। এই দেশ আমাকেই গড়ে তুলতে এবং রক্ষা করতে হবে' এই আবেগ অধিকাংশ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যেই তৈরি হয় না বা থাকে না। শ্রমজীবী মানুষ দেখে যে তারা পরিশ্রম করছে আর তার বিনিময়ে মালিক পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় গড়ে উঠছে, তারই সৃষ্টি করা সম্পদে তার কোনো অধিকার নেই; যার ফলে তার মানসিকতায় থাকে যে সে কারখানায় কাজ করে একান্তই তার নিজের জন্য। এরই ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে মাইনে করা সৈন্যরাই 'দেশরক্ষায়' লড়তে যায়। তাও অনেক ক্ষেত্রে আইনের জোরে, বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করে! একই কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনগণ বৈদেশিক আক্রমণের সময় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ যদি এই সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে, তার পরিকল্পনা এবং রূপায়নের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন না করত যে 'দেশটা আমার, আমাদের; এই দেশকে জীবন দিয়ে হলেও আমাদেরই রক্ষা করতে হবে' তাহলে তারা মরণপণ লড়ত না। স্ট্যালিনের নেতৃত্ব যদি সোভিয়েত জনগণের মধ্যে এই আস্থা এবং আবেগ সৃষ্টি করতে না পারত তাহলে দেশের জনগণকে এই ধরনের গণপ্রতিরোধে নামানো যেত না। বাস্তবে এই আবেগ থেকেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়নের সময় স্বেচ্ছা শ্রমদান আন্দোলন (Subotnik movement), স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টায় প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন (Stakhanovite Movement), প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। স্ট্যাখানভ নামে এক কয়লাখনি শ্রমিক নিজস্ব চেষ্টায়, খনিতে কাজের ফাঁকে পড়াশুনা করে কয়লা উত্তোলনের উন্নততর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। স্ট্যালিন গোটা দেশের শ্রমিকদের সামনে স্ট্যাখানভের উদাহরণ তুলে ধরে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনে উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রনোদিত সংগ্রামকে একটা আন্দোলনে পরিণত করতে পেরেছিলেন। এইসব কারণে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া খুবই কম সময়ে অর্থনীতি এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও, বিপুল অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল, যা শত্রুদেরও বিস্মিত করেছিল। রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময়, যখন দেশের মানুষের ভাল করে খাদ্যও জুটছিল না, তখনও একদল স্বেচ্ছাসেবক শ্রমিক প্রযুক্তিবিদ দিনরাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেষ্টা করে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আক্রমণকারী শত্রুর অস্ত্র-শস্ত্র মোকাবিলা করার জন্য নতুন নতুন উন্নততর যুদ্ধাস্ত্রের উদ্ভাবন করে গেছেন, যা 'অপ্রতিরোধ্য' জার্মান যুদ্ধযন্ত্রকে চুরমার করে দিতে পেরেছিল! এটা তারা তাদের মাইনে বাড়বে বা আর্থিক সুযোগ সুবিধা বাড়বে, যেকোনো পুঁজিবাদী দেশে যা হয়, সেজন্য করেননি; করেছিলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে রক্ষার গভীর আবেগ এবং প্রয়োজনবোধ থেকে। বাস্তবে সোভিয়েত শ্রমিক প্রযুক্তিবিদরা দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং সেই সময়ের অতি উন্নত যুদ্ধাস্ত্র, যেমন, কাটিউশা রকেট লঞ্চার, ২৬ টনের ৩৪, ট্যাংক এসব তৈরি করেছিলেন, যা সমস্ত সমর বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই জাতীয় অস্ত্রের মধ্যে সবথেকে কার্যকরী বলে স্বীকার করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম এক বছরের মধ্যেই লালফৌজ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বিমান প্রভৃতি হারায়। লালফৌজকে কোথাও পিছু হঠতে হলে তারা যে যন্ত্রপাতি পিছনে নিয়ে আসতে পারত না তা নষ্ট করে দিত, যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে। কিন্তু ফ্রন্টের পিছনে সচল কারখানাগুলো বিপুল পরিমান অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি প্রতিনিয়ত উৎপাদন করে সরবরাহ বজায় রাখত এবং উন্নততর অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদন করে সরবরাহ করত। এরকম আরো বহু নতুন যন্ত্রপাতি সোভিয়েত

প্রযুক্তিবিদরা দেশরক্ষার প্রয়োজনে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে তৈরি করেছিলেন।

স্ট্যালিন গোটা দেশকে আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন

নভেম্বর বিপ্লবের সময় থেকেই বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে নানান প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল। নভেম্বর বিপ্লবের সময়েই জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ মনে করেছিলেন এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় আসেনি। তারা লেনিনের বিপ্লবের ডাক দেওয়ার প্রশ্নে একমত হতে পারেননি।

আবার শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্মিলিত আক্রমণের সামনে একদেশে সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নে ট্রটস্কি এবং আরো কিছু 'মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের' সাথে লেনিনের মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। এইসব তাত্ত্বিকরা মনে করেছিলেন একদেশে সমাজতন্ত্র কোনোমতেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়! ১৯২৩ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রটস্কি আবার এই প্রসঙ্গ তোলেন। সোভিয়েত বিপ্লবের পর যৌথখামার গড়ে তুলতে গিয়ে ধনী চাষি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের দ্বন্দ্বকে কীভাবে দেখতে হবে এই প্রশ্নে আরেক কেন্দ্রীয় নেতা বুখারিণের মতপার্থক্য ছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল লেনিনের উত্তরসূরি কে, এই প্রশ্ন। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শগত প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকলেও ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এরা একজোট হয়ে গিয়েছিলেন। আরো বেশ কিছু প্রশ্নে এরা দলের অভ্যন্তরে ঘোঁট পাকাতে শুরু করেন। ট্রটস্কি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে স্ট্যালিন লেনিনবাদ কী তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন যা মার্ক্সবাদী জ্ঞানভান্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। এই লেনিনবাদের শিক্ষাগুলিকে ভিত্তি করেই স্ট্যালিন বিভেদকামীদের বিচ্ছিন্ন করে গোটা পার্টিকে একজোট করেন। এদের মধ্যে একদল প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, জার্মানি-সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ শুরু করে। দল এবং রাষ্ট্রের নানান স্তরে যে বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গুপ্তচর কাজ করছে তার নানান প্রমান ৩০'র দশকের গোড়ার দিকেই পাওয়া যায়। দল এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে স্ট্যালিন '৩৪ থেকে '৩৬ সাল জুড়ে দলের শুদ্ধিকরণ অভিযান শুরু করেন, যা great purge নামে বিখ্যাত। এর পরিণতিতে ১৯৩৮-এ মস্কো মামলা যাতে বেশ কিছু কেন্দ্রীয় নেতাদের শাস্তি হয়। এই পার্জ এবং মস্কো মামলা নিয়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় ব্যাপক স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা এবং প্রচার আছে। স্ট্যালিনকে গণহত্যাকারী এবং রক্তপিপাসু দানব হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। মার্ক্সবাদের নাম নেয় যে ট্রটস্কিপন্থীরা, তারাও এই পার্জ নিয়ে বহু অপপ্রচার করে। স্ট্যালিন নিজেই দলের অষ্টাদশ কংগ্রেসের রিপোর্টে স্বীকার করেছিলেন দলকে পুঁজিবাদের গুপ্তচরদের হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে বহু ভুল ত্রুটি হয়েছে এবং দলের কিছু একনিষ্ঠ সদস্যেরও প্রাণ গেছে। কিন্তু এই পার্জের ফলেই সোভিয়েত জার্মান যুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরে তাদের গুপ্তচর বাহিনীর বা পঞ্চম বাহিনীর কোনো সহায়তা পায়নি, যা এর আগের সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে হিটলারের বাহিনী খুব সহজেই পেয়েছিল এবং সেই সব দেশের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করে আঘাত করতে পেরেছিল!

মহাশক্তিশালী জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে কার্যত একাই লড়তে হয়েছিল

রুশ-জার্মান যুদ্ধ যখন পুরো দস্তুর চলছে, তখন রাশিয়া, ইংলন্ড এবং আমেরিকা মিত্রশক্তি। সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল লোকদেখানো কায়দায় স্ট্যালিনকে কিছু অস্ত্র সাহায্য দেবার কথা বলে। স্ট্যালিন বারবার তাদের অনুরোধ করলেন ইউরোপে একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলতে যাতে জার্মানি যে তার সমগ্র সমরশক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করছে তা যেন দ্বিধাবিভক্ত হতে পারে। কিন্তু রুজভেল্ট চার্চিলরা এই প্রস্তাব নিয়ে কিছু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছুতেই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে রাজি হলেন না। এমনকি জার্মানরা রুমানিয়া দখল করে তার তৈলক্ষেত্রগুলির জ্বালানি তেল রাশিয়ার যুদ্ধে ব্যবহার করছিল; চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোডা কোম্পানি জার্মান বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করছিল। স্ট্যালিন আমেরিকাকে অনুরোধ করেন এগুলো বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করে দিতে; কিন্তু সেই সময় তারা কিছুতেই এটা করলেন না। অথচ যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ে, যখন জার্মানি পরাজিত এবং পিছু হঠছে, রুশ লালফৌজ যখন একের পর এক দেশ থেকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করে গোটা ইউরোপ মুক্ত করার দিকে যাচ্ছে, জার্মানির পরাজয় যখন নিছক সময়ের অপেক্ষা, সেই সময় গোটা ইউরোপ যাতে সোভিয়েত লালফৌজের দখলে না চলে যায় তার জন্য ৬ জুন ১৯৪৪-এ ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডিতে ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজ অবতরণ করল। সে সময় পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত জার্মান অধিকৃত দেশে ট্যাংক বিমান যা কিছু ছিল সব পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে পিছু

হঠতে থাকা জার্মান ফৌজ তখন রুশ লালফৌজের প্রতিআক্রমণে বার্লিনের পতনকে কিছুটা বিলম্বিত করার চেষ্টা করছিল। আশ্চর্যের বিষয় যখন মিত্রশক্তির শরিক রুশ লালফৌজ জার্মান বাহিনীকে তাড়িয়ে রুমানিয়াকে মুক্ত করতে যাচ্ছে, সেই সময় আমেরিকান বিমান রুমানিয়ার তৈলক্ষেত্রগুলিতে বোমাবর্ষণ করে সেগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল, যাতে সেগুলি রুশ বাহিনীর হাতে না পড়ে! এমনকি লালফৌজ যখন পূর্ব দিক থেকে ঢুকে পড়ে জার্মানির রাজধানী বার্লিনের প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে, দু-এক দিনের মধ্যেই বার্লিন দখল করবে তখন পশ্চিমদিক থেকে আসা ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী বার্লিন থেকে অনেক দূরে, তারা তখন বার্লিন দখলের কৃতিত্বে ভাগ বসানোর জন্য আমেরিকান ছত্রিসৈন্য বার্লিনে নামিয়ে দিল এবং রুশ বাহিনী তাদের আগে বার্লিন এবং দখল করে রাইখস্ট্যাগের উপরে লাল পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারা মিত্রবাহিনীকে বাধা দেয়নি বলেই ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী বার্লিনের একটা অংশ তাদের দখলে রাখতে পারল। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নিজে স্বীকার করেছেন যে ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী সেই সময় যেখানেই রুশ বাহিনীর সামনা-সামনি হয়েছে তারা মিত্রশক্তির সদস্য রুশ বাহিনীর উপর গুলি চালিয়েছে। (তথ্যসূত্র, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রথম খন্ড)।

জাপানে পরমাণু বোমা ফেলার প্রয়োজন ছিল না

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সবথেকে করুণ অংশ জাপানের পতন। বাস্তবে ৮ মে ১৯৪৫ তারিখে হিটলারের পতনের পর একা জাপান তখন ধুঁকছে। যে কোনো দিন আত্মসমর্পন করবে। চীন তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছে। এই সময় ৬ই আগষ্ট হিরোসিমায় এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো আমেরিকা। এই দুটি শহরেই বড় কোনো মিলিটারি ঘাঁটি ছিলনা। ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধআপামর সাধারণ মানুষ। দুটি বোমার আঘাতে দুটি শহর পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দুটি শহর মিলিয়ে বিস্ফোরণের দিন এবং ১৯৪৫ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের প্রাণ গেল। গোটা বিশ্বে প্রশ্ন উঠেছে এই পরিকল্পিত নৃশংস নরসংহারের কি কোনো প্রয়োজন ছিল? জাপানি সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে বিমানবাহিনী পার্ল হারবারে আঘাত করেছিল আমেরিকান নৌবহর ধ্বংস করার লক্ষ্য নিয়ে। এর পিছনে অবশ্যই জাপানি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ যুক্ত ছিল। কিন্তু হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণ নিছক মানুষ মারার জন্য। এর প্রয়োজন ছিল একটাই, তা হচ্ছে বিশ্বকে পরমাণু যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্বের রাজনৈতিক বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ শতকের মধ্যভাগে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে; পরিবর্তন ঘটে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। আক্রমণকারী জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে শক্তি সাফল্য এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল সেই শক্তি এই সময় চীনের বিপ্লবীরা ঘুরিয়ে ধরে চীনের কম্প্রাডর পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে এবং চীনে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক চীনের অভ্যুত্থান হয়। এছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন হয় এবং সেইসব দেশ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেয়। এর পাশাপাশি ইউরোপের নটি দেশ, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী, আলবানিয়া; অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর পর্বে জার্মানির ফ্যাসিস্ট বাহিনী দখল করেছিল; তাদের পশ্চাদপসারনের সময়ে, সোভিয়েত লালফৌজ পাল্টা মার দিতে দিতে জার্মান বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় সেইসব দেশের প্রগতিশীল এবং কমিউনিস্ট শক্তিগুলোকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ে জার্মান ফ্যাসিবাদী ফৌজকে পরাস্ত করে। ইউরোপে রাশিয়া সহ এরকম মোট নয়টি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেয়। সমাজতান্ত্রিক শিবির পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার যেসব দেশগুলি বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশ ছিল, এই সব দেশগুলোও স্বাধীনতা লাভ করে। এই সব দেশে গণ আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবি সোচ্চার হয়। যার ফলে

বিংশ শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন দুনিয়া নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। এই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতির ফলে বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বিশেষতঃ একটা ভাল সংখ্যক উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়, এবং ভারত মিশর-সহ আরো অনেক দেশ যুক্ত হয়ে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু করে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন এযুগের অগ্রগামী মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন, ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সমান্তরাল বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতি, পূর্বের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদের শক্তিহীনতা, সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বহু দেশের স্বাধীনতালাভ, নতুন নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর নিজ নিজ দেশের জাতীয় সরকার গঠন, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহুদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি প্রভৃতির ফলে দুনিয়া জোড়া এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের আয়ু বোধহয় আর বেশি দিন নেই। মনে হয়েছিল দেশে দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণি, তথা শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলন গুলোর সামনে সত্যই একরকম উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল''। (নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি) । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের হাতে জার্মানির পরাজয়ের ফল হিসাবে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব হয়েছিল, এই শিবির সেদিন বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী এবং যুদ্ধচক্রান্তকে বেশ কিছুটা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত বা বিশ্বের আরো বহু 'উন্নয়নশীল' অর্থাৎ নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশ, খাদ্য সংকটের সময় রাশিয়ার চাল; শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাশিয়ার প্রযুক্তিগত সাহায্য পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের দখলে থাকা সুয়েজ ক্যানাল নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মিশরের নাসের সরকার জাতীয়করণ করলে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স রণতরী পাঠায়। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১২ ঘন্টার মধ্যে ইলংন্ড এবং ফ্রান্স তাদের রণতরী ফেরত না নিলে প্রত্যাঘাতের হুমকি দিতেই তারা ভয়ে পিছিয়ে যায়। এই ভাবে আরো বহু ক্ষেত্র, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলিতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধচক্রান্ত এবং দখলদারী প্রতিহত করে শান্তি বজায় রাখতে সমাজতান্ত্রিক শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় হলেও ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হয়নি

হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান ফ্যাসিবাদের যুদ্ধে পরাজয় হলেও পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদের বিপ্লবভীতির অবসান হয়নি, যার ফলে ফ্যাসিবাদের বিপদেরও অবসান হয়নি বরং তা আরও বেড়েছে। ফ্যাসিবাদের এই দিকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এযুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ''গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণ বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অশেষ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জার্মান, জাপান ও ইটালির ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন সত্বেও দেখা গেল বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির (যারা সবাই 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট'-এর যোদ্ধা ছিল) সর্বত্রই এমনকি তাদের উপনিবেশগুলির মধ্যেও ফ্যাসিবাদ নতুন কৌশলে নতুন রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠছে। যুদ্ধ বিজয়ের ঢক্কানিনাদে জনসাধারণ তো দুরের কথা ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের চাম্পিয়ান বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল;তারা বুঝতেই পারল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা ধ্বংস হয়েছে তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শুধুমাত্র জার্মানি, জাপান বা ইটালির ফ্যাসিস্টদের রাষ্ট্র বা সামরিক শক্তি। ফ্যাসিবাদ তো ধ্বংস হয়ইনি বরং বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনসাধারণ ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির প্রভাবে বিশেষভাবে এখনও প্রভাবান্বিত।'' (গান্ধীবাদ, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদের ভিত্তি)

শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বিশ্বের দেশে দেশে, অগ্রসর এবং অনগ্রসর সমস্ত দেশেই, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। ফ্যাসিবাদ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। অর্থনীতির চূড়ান্ত সামরিকীকরণ, রাজনীতিতে পার্লামেন্টারি ঠাঁটবাট বজায় রেখেই নানাভাবে মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ; বিচারবিভাগ, প্রশাসন, এবং আইনবিভাগের আপাত স্বাধীনতা নষ্ট করে সবগুলোকেই একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত করা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের

কারিগরী দিক এবং আধ্যাত্মবাদের অন্ধ আনুগত্যের মানসিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যুক্তিবাদী মন, এবং বিবেক মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করা; এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ মাথা তুলছে।

সংশোধনবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম চাই

স্ট্যালিনের অসামান্য নেতৃত্বে যে সমাজতন্ত্রকে ব্রিটেন, আমেরিকার মদতে জার্মানি সর্বাত্মক আক্রমণ করেও ধ্বংস করতে পারেনি, চীন বিপ্লবকে জাপান-আমেরিকার আক্রমণও ধ্বংস করতে পারেনি, সেখানে, এটা গভীর বেদনার বিষয় যে স্টালিন বা মাওয়ের মত নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে, আধুনিক সংশোধনবাদ মাথা তুলে লেনিন-স্ট্যালিনের গড়ে তোলা সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এবং মাওয়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা চীনের সমাজতন্ত্রকে ভেতর থেকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিল! ক্রুশ্চেভরা স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা করলেও স্ট্যালিন সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে, রক্ষা করতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, ক্রুশ্চেভ এবং তার অনুগামীরা তারপর সমাজতন্ত্রকে একচুলও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, বরং ধ্বংস হতেই সাহায্য করেছে, আজ এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত। মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন, স্ট্যালিন মাও, এবং এদের অনুগামী শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে এই সংশোধনবাদের চরিত্রকে বুঝতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক শিবির অবলুপ্ত হওয়ার ফলে আজ আবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ প্রবল শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, প্যালেস্টাইন, কসোভো, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশের যুদ্ধ এবং গণহত্যা সেই কথাই দেখিয়ে দেয়। ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়ের ৮০ তম বছরে একদিকে যেমন সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ঘন কালো মেঘ মাথা তুলছে, তখনই আবার বিশ্বের দেশে দেশে যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদী শোষণ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে মানুষের একের পর এক গণ আন্দোলনের ঢেউ উঠছে, মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে মিছিল হচ্ছে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠছে। এই আন্দোলনগুলিকে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ভিত্তিতে পথ দেখাতে হবে, এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে সংকটের ঘন কালো মেঘের মধ্যে আশার রুপোলি রেখা। ◘